# গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারা পাল্টে দিতে পারে

ইদিশতা নবী

পেপারলেস অফিস বা কাগজবিহীন দপ্তর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের এক দশক পরে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে তার জরীপ কাজ শুরু করেছে। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরীপ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যুক্তরাজ্যের অফিসগুলোতে গড়ে প্রতিদিন ১০ হাজার ফাইলিং ক্যাবিনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় বাণিজ্যিক তথ্যের মাত্র ৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হচ্ছে কমপিউটারে বাকী ৯৫ শতাংশ তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ফলে গড়ে প্রতিটি অফিসের প্রতি জন ডেস্ক কর্মকর্তার বছরে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের সমপরিমাণ কর্মঘন্টা ব্যয় হয় ঐসব তথ্য খুঁজে পেতে।

প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি যুক্তরাজ্যের মত উন্নত বিশ্বেও অফিস অটোমেশনের জন্য যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর জবাবে বলা যায় অবশ্যই গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য মতে ১৯৮০ থেকে ৯০ এ দশ বছরে অফিস অটোমেশনে বৃটেনে বাজেট বেড়েছে ৭ গুণ। বেড়েছে ই-মেইলের ব্যবহার।

কাজগবিহীন দপ্তর বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত ই-মেইলের ব্যবহার উন্নত বিশ্বে এখন অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অনুন্নত বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশসহ এশিয়ার এতদঅঞ্চলে যেখানে টেলিকম শিল্পের মূল ব্যবহার টেলিফোন আর ফ্যাক্সে সীমিত সেখানে ই-মেইল এখনও অনেকটা অভিনব বস্তু। ই-মেইল সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় এটি হলো টেলিকমিউনিকেশন লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রেরক ও গ্রাহকের মাঝে নন-ইন্টার একটিভ পদ্ধতিতে টেক্সট, চিত্র, স্বর এবং তথ্যের বিনিময়। এক্ষণে এটি প্রমাণিত সত্য যে টেলিফোন, ট্যাদেক্স ও ফ্যাক্স বৃহত্তর অর্থে কমপিউটারভিত্তিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার আওতাধীন। অতএব ই-মেইলকে ক্ষুদ্র অর্থে কমপিউটার থেকে কমপিউটারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথ্য বিনিময়ের প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য না করাই উত্তম।

ই-মেইল ব্যবহারের সুবিধা পাওয়ার জন্য মৌলিক যে বিষয়গুলোর চাহিদা রয়েছে সেগুলো হলো একটি কমপিউটার, একটি মোডেম এবং টেলিফোন লাইন। ই-মেইলের ব্যাপক ব্যবহারযোগ্যতা, সময়ের সাশ্রয়তা এবং কম ব্যয়সাধ্য হওয়ার কারণে গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ৬,০০০ ই-মেইল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। আর ই-মেইলের ব্যাপক সফল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই নতুন যে প্রযুক্তি সেবার উদ্ভব ঘটেছে তা হলো গ্রুপওয়্যার।

নতুন প্রযুক্তি গ্রুপওয়্যারের মূল লক্ষ্য হলো অফিসের সব স্তরের কর্মীকে সাপোর্ট দেয়ার মাধ্যমে কাজের মধ্যে ঐক্যতান রচনা করা এবং কাজের গতিতে অভাবনীয় দ্রুততার সংযোজন ও সমন্বয় সাধন। গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তির প্রচলনের আগে অফিস অটোমেশনে মূলতঃ ওয়ার্ড প্রসেসিংকেই গুরুত্ব দেয়া হতো। এখন সে ধারায় পরিবর্তন আসছে।

গ্রুপওয়্যারের মূল লক্ষ্যটি হলো যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে একটি অফিসের সবাই জানতে পারে অফিসে কি হচ্ছে এবং প্রয়োজনে নিজে ঐ কাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তির যে দর্শন তার অস্তিত্ব অনেক অফিসে আগেও ছিল। কিন্তু ছিল না কোন কার্যকর প্রয়োগ কিংবা থাকলেও তথ্য বিনিময় প্রবাহ এত ধীর ছিল যে কোন একটা কাজে কর্মীদের দক্ষতার ঐক্য সাধন হতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। একটা উদাহরণ দেয়া যাক– বাংলাদেশের কোন একটা সরকারী বা বেসরকারী অফিসের কথাই চিন্তা করুন। যে সংস্থার কোন একটা কাজে হয়তো প্রশাসনিক শাখায় কর্মকর্তারা একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে এক মাস পরে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা লক্ষ্য করলেন সিদ্ধান্তটি পরোক্ষভাবে সংস্থার জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিকর। তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে ফাইল তৈরী করে পাঠালেন প্রশাসনিক দপ্তরে। এ নিয়ে প্রশাসনিক শাখা আবার সভা আহ্বান করল সেখানে অর্থ বিভাগের লোকও থাকল। বিষয়টি মিমাংসা করল। সব দপ্তরে নতুন সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এবার বিক্রয় বিভাগ সমস্যায় পড়ল। অতএব আবার নোট, পাল্টা নোট ; ফাইল চালাচালি। অতঃপর ৬ মাস বাদে সব কুল রক্ষা করে একটি কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলো। অথচ এক্ষেত্রে গ্রুপওয়্যারের ব্যবহার ঘটলে একবারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নেয়া সম্ভব হতো। এখানেই গ্রুপওয়্যারের সার্থকতা। গ্রুপওয়্যারের প্রাণ হচ্ছে ই-মেইল। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওভামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ওভামের মতে 'ই-মেইল ইজ দি মাদার অফ গ্রুপওয়্যার'।

গ্রুপওয়্যারকে বলা যায় চারটি কাজের সমন্বয়ক। এটি তথ্য খুঁজে বের করে, তথ্যের ব্যবহার ঘটায়, অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা দেয় এবং সভায় উপস্থিতির সুবিধা দেয়। গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিজনেস ইনটেলিজেন্সের মতে 'গ্রুপওয়্যার, ই-মেইল এবং কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অন্যকে যোগাযোগের ব্যর্থতায় সৃষ্ট হতাশা এবং অযথা সময়ক্ষেপন থেকে ব্যক্তি ও সংস্থাকে রক্ষা করে। এর ফলে সার্বিকভাবে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাজের গতি অবধারিতভাবে বেড়ে যায়।'

গ্রুপওয়্যারের সব থেকে বেশী ব্যবহার ঘটতে পারে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে। কারণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো উন্নত ও কার্যকরী যোগাযোগ। উন্নয়নশীল বিশ্বে হাজার হাজার সংগঠন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত। যেমন বাংলাদেশে আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে ১৬,০০০ এর অধিক এনজিও বা বেসরকারী সংস্থা কাজ করছে। নিজস্ব কাজের ধারায় এনজিওগুলো আপনা-আপনি মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। কিন্তু সুষ্ঠু কোন তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা পড়ে না উঠায়, আবার কখনো কখনো কাজের ব্যস্ততায় এনজিওগুলো নিজেদের মধ্যে কাঙ্খিত মাত্রায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে না। আবার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজন পড়ে অন্য দেশের সমমনা বা সমকাজে ব্যাপৃত সংস্থাগুলোর সংগেও। ধরা যাক বাংলাদেশের একটি সমন্বয়ক এনজিও ভিএইচএসএস এর কথা। স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করে এমন সংস্থাগুলোর সমন্বয়ক এ সংস্থাটি সমকাজে ব্যাপৃত বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমন্বয়ক সংস্থার সাথেও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে। ট্যালেক্স ও ফ্যাক্স যেন তথ্য বিনিময়ের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এখন সংস্থাটি ই-মেইল এবং গ্রুপওয়্যারের প্রযুক্তি স্থাপনের কথা বেশ জোরে-শোরে ভাবছে।

এমন ভাবনার প্রসার এ দেশ ও জাতিকে সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। কারণ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো যখনই সহজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডাটা ব্যাংক বা তথ্য ভান্ডারে চাহিবামাত্র প্রবেশ করে টেকনিক্যাল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তখন কাজের গুণগত মানে আসবে অভাবিত পরিবর্তন। বেসরকারী উদ্যোগে কোন কোন প্রতিষ্ঠান অবাঞ্ছিত এই সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ই-মেইল তথা গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তিকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করতে অসীম ধৈর্য্য নিয়ে কাজ করে চলছে। কারণ চাইলেই এটির ব্যাপক ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব নয়। এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন উন্নততর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এজন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকা জরুরী। আর ই-মেইল যেহেতু এদেশে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি তাই এর বিকাশে ব্যবহারকারীর ব্যাপক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অফিস ব্যবস্থাপকদের চিরাচরিত কর্মস্থল সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরী। সব কিছু কাগজে লেখার মানসিকতায়ও আনতে হবে পরিবর্তন। কাগজবিহীন দপ্তর চিন্তাধারার সাথে হতে হবে একাত্ম। নতুবা ই-মেইল তথা গ্রুপওয়্যার সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে চালু সম্ভব হবে না। এক কথায় বলা যায় দপ্তরের সংস্কৃতি ও কাজের প্রতি মনোভঙ্গি একই সময়ে সমান্তরালভাবে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি কমপিউটারের উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতাও কমিয়ে আনতে হবে। নতুবা দেখা যাবে বর্তমানের কাগজের স্থান দখল করে বসবে কমপিউটার। ফলে গ্রুপওয়্যার সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

১৯৮০ দশকে উদ্ভাবিত গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তির বিকাশ যখন ক্রমশঃ উন্নত বিশ্বে বাড়ছে তখন তা এদেশে পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর আগেই রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এমন কোন চর্চা নিশ্চয়ই কোন প্রযুক্তি সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বা সংস্থা চাইবেন না। বরং এর দ্রুত প্রসারে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবেন সেটাই কাম্য। কারণ গবেষণা থেকে দেখা গেছে এটি তুলনামূলকভাবে সস্তা, ব্যবহারে সহজ, উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম। যে কারণে ১৯৮৯ সালের তুলনায় নেটওয়ার্কে সংযুক্ত মোট পারসোনাল কমপিউটার সংখ্যা বিশ্বে অন্ততঃ ১২ গুণ বেড়েছে। অন্য এক গবেষণালব্ধ তথ্য মতে ১৯৯১ সালে বিশ্বে ইলেকট্রনিক মেইলবক্সের সংখ্যা ছিল ৫৯ লাখ। বর্তমানে এর সংখ্যা বিশ্বে প্রায় ২৩৮ লাখ। এর জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে সহজ কথায় বলা যায় গ্রুপওয়্যার ব্যবহারের জন্য বিশ্বের অসংখ্য মানুষ এখন মানসিকভাবে এবং প্রযুক্তি অর্জনপভাবে প্রস্তুত।

জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণটি হলো এর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা। যে কোন প্রতিষ্ঠানে গ্রুপওয়্যারে কাজ করছে এমন একটি দলের সিদ্ধান্তকে কাজ করে না এমন দলের সিদ্ধান্তের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়। তাই প্রযুক্তি বিশ্বের বোদ্ধারা পরামর্শ দিচ্ছেন, যারাই তাদের কর্মস্থলে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক করতে চাচ্ছেন তারা যেন গ্রুপওয়্যারের বিষয়টি সচেতনভাবে বিবেচনা করেন।

বাংলাদেশও এই পরামর্শের বাইরে নয়। প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বে নিজেকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে এমন প্রত্যাশা প্রযুক্তিমনস্ক প্রত্যেক বাঙালীর। □